BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020200011

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2 | Issue: 2 | March 2024 | e-ISSN: 2584-1890

আগুনপাখি : জননী থেকে দেশ-জননী হয়ে ওঠার আখ্যান

সুব্রত পুরকাইত

Associate Professor; Department of Bengali; Behala College; Kolkata-700060.

Email: subratapurkait73@gmail.com

Abstract: *হাসান আজিজুল হক এর বিখ্যাত উপন্যাস 'আগুনপাখি'। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যেসব গল্প, উপন্যাস রচিত হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে তার মধ্যে অন্যতম উপন্যাস 'আগুনপাখি'। দেশভাগ শুধুমাত্র যে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে তা নয়, তা একটি সংসারের মধ্যেকার আপন জনের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই রূপরেখা তুলে ধরেছেন। গ্রাম্য ও চরম দারিদ্র্যে বড় হওয়া এক নারী বিবাহের পর নতুন সংসারে যখন প্রবেশ করে তখন তার আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি হয়। ক্রমে সেই আইডেন্টিটি জননীতে রূপান্তরিত হয়। একজন 'স্ত্রী' এবং একজন 'জননী' এই দুই সত্তার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। একজন স্ত্রী সইতে পারেন অনেক, কিন্তু একজন জননী সেই পথ নাও অবলম্বন করতে পারেন। তিনি প্রয়োজনে সংসারের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীন সত্তাকে দাঁড় করাতে পারেন। নানান প্রশ্নে জর্জরিত করে দিতে পারেন। প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারকে ধাক্কা দিয়ে, পরের উপর নির্ভরশীলতার মিথ্যে বনিয়াদকে টলিয়ে দিতে পারেন। নিজেকে নতুন করে আবার গড়ে নিতে পারেন। নিজেকে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে নতুন করে চিনিয়ে দিতে পারেন। এমনই এক 'নারী', তার চিরন্তন 'জননী'র গন্ডি অতিক্রম করে 'দেশ-জননী' হয়ে ওঠার পথে নির্ভীক চিত্তে পাড়ি দিতে পারেন।*

Keywords: *আগুনপাখি, হাসান আজিজুল হক, দেশ-জননী।*

Discussion:

'দেশভাগ' শব্দটি এখন আর তেমন করে আমাদের মধ্যে নতুন কোন অনুভূতি জাগায় না। তবে দেশভাগ সত্যি সত্যিই যখন হয়েছিল- যখন ভারতবর্ষ ভেঙে তিন টুকরো হয়েছিল, সেই তিন টুকরোর মধ্যে দু-টুকরো যখন মিলেমিশে গিয়েছিল, আবার সেই দুটো টুকরো যখন আলাদা হয়েছিল, তখন দেশভাগের সত্যিই একটা অর্থ উপলব্ধি করেছিল মানুষ। সেই দেশভাগে একটা যন্ত্রণা ছিল, বেদনা ছিল। দেশভাগ তো শুধু আর দেশকে ভাঙে না, দেশ ভাঙলে সমাজ ভাঙে, সম্পর্ক ভাঙে, মানুষের মন সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়।

বিদ্বান, শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টিতে দেশভাগের অর্থ কি? সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষের দৃষ্টিতে দেশভাগের অর্থ কেমন? গ্রাম্য অশিক্ষিত নারীর দৃষ্টিতে দেশভাগের প্রকৃত অর্থই বা কি? এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর কখনো এক হয় না। দেশভাগ

আসলে কি? দেশভাগের প্রয়োজনটাই বা কোথায়? এই সম্পর্কে নানান কথা বুঝিয়েছে পুরুষ। বুঝেছে নারী। সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরুষ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে নারী। কিন্তু নারীর তো কথা থাকতে পারে! তার নিজের তো আলাদা কোন ইচ্ছে থাকতে পারে! তা কেউ কখনো ভেবেছেন? অবশ্যই কেউ কেউ ভেবেছেন। যেমন হাসান আজিজুল হক ভেবেছিলেন। সত্যিই তো, এমন তো হতেই পারে। নারী তো এমন করে ভাবতেই পারে! এমনই নতুন এক ভাবনা 'আগুনপাখি' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাধারণ দরিদ্র পরিবারে লালিত পালিত এক নারী, যে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করে কথা বলতে জানেনা, মাথা উঁচু করে কথা বলতে শেখেনি, সেই নারী একদিন মা হয়। জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে করতে সে দেখে অনেক কিছু। একদিন সেই জননী প্রশ্ন করতে শেখে। তার প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব কেউ দিতে পারে না। এতদিন তাকে যারা বুঝিয়েছিল, যাদের কথা সে বুঝেছিল, তারাও তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম। উপন্যাসের শেষে তাই সেই জননী নিজের নেওয়া সিদ্ধান্তে অটল থেকে যায়। নিজের অনুভূতিকে সম্মান জানাতে চায়। নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে নিতে চায়। যে ছিল একজন সাধারণ নারী, সে জননী রূপে হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী এক চরিত্র। যে 'সে' থেকে 'তিনি'তে উন্নীত হয়। যে সাধারণ জননী থেকে বিশেষ জননীতে উত্তীর্ণ হয়।

২.

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯ - ২০২১) বর্ধমান জেলার যবগ্রামে এক অবস্থাপন্ন যৌথ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা মোহাম্মদ দোয়া বখশ্ আর মা জোহরা খাতুন। ১৯৫৪ খ্রি. যবগ্রাম মহারানী কাশীশ্বরী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৬ খ্রি. খুলনা শহরের অদূরে দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপরই সম্ভবত তিনি দেশ ত্যাগ করেন। সরাসরি কোথাও না বললেও কয়েকটি ছোট গল্পে সেই অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। যেমন 'খাঁচা', 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' ইত্যাদি। ১৯৫৮ খ্রি. রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স সহ তিনি বি.এ. পাস করেন। ১৯৬০ খ্রি. তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে তিনি অস্ট্রেলিয়া গেলেও সেখানে তাঁর মন বসেনি। ফিরে এসে ১৯৬০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি রাজশাহী সিটি কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ, খুলনা গার্লস কলেজ এবং দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৩ খ্রি. তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ পর্যন্ত একনাগাড়ে ৩১ বছর অধ্যাপনা করেন। 'সমকাল' পত্রিকায় ১৯৬০ খ্রি. 'শকুন' নামক গল্পটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য অঙ্গনে পরিচিত হন। ওই একই বছরে 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে' প্রকাশিত হওয়ার পরেই তিনি বিশিষ্ট কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন।

হাসান আজিজুল হক সারা জীবনে তিনটি উপন্যাস আর দুটি উপন্যাসিকা লেখেন। আসলে তিনি ছোটগল্পের ভেতর ব্যাপ্ত পরিসর রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাই উপন্যাস লেখার তেমন তাগিদ অন্তরে অনুভব করেননি। ২০০৬ খ্রি. তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আগুনপাখি'। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পূর্বে ২০০৫ খ্রি. প্রথম আলো ঈদ সংখ্যায় 'অপ-রূপকথা' নামে আখ্যানের অর্ধাংশ প্রকাশিত হয়। ২০০৮ খ্রি. তিনি এই উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন।

'আগুনপাখি' উপন্যাসে একজন গ্রাম্য নারীর দেশভাগ জনিত কিছু জিজ্ঞাসাকে লেখক, পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। নারী চরিত্রটি (যার কোন নাম দেন নি লেখক) সমগ্র উপন্যাসে উত্তম পুরুষে কথা বলে। সেই নামহীনা নারীর কথায়, চিন্তায়, অনুভূতিতে উপন্যাসের কলেবর সজ্জিত।

৩.

'আগুনপাখি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রটি আর পাঁচজন সাধারণ গ্রাম্য নারীর মতো সমাজের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের পালিত হওয়া একটি মেয়ে একদিন একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের গৃহবধূ হয়। তার স্বামীরা পাঁচ ভাই। তাদের সন্তান-সন্ততি এবং বাল্যবিধবা বোন ও শাশুড়িকে নিয়ে ভরা সংসার। সেখানে স্বামীকে নিয়ে স্বল্পবয়স্ক মেয়েটির মুগ্ধতার শেষ নেই। শাশুড়ির ব্যক্তিত্বে ও নেতৃত্বে সে অবাক হয়। সংসারের মধ্যে সময় কাটাতে কাটাতেই সে কখনো কখনো আনন্দ পায়। বাৎসল্যের দোলায় দুলতে দুলতে জীবন পথে এগিয়ে চলে। খুব কাছ থেকে সে দেখে সংসারের ক্রম উন্নতি। সম্পদে, সম্মানে ধীরে ধীরে পরিবারটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিস্তৃত এবং বিন্যস্ত সুখের মাঝে হঠাৎ বেজে ওঠে বিশ্ব যুদ্ধের দামামা। সে শুধু কানে শোনে, কিন্তু বুঝতে পারে না কিছু। নিজের মতো করে বুঝলেও বোঝাতে পারে না কাউকে। বিশ্বযুদ্ধের সেই আগ্রাসনে টান পড়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগানে। এর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাজির হয় কলেরা, বসন্ত ও দুর্ভিক্ষ। পরপর দু'বছর ফসল হানি হয়। একবার খরায় আর একবার অতি বৃষ্টিতে। নিয়তির সেই ভয়ানক ভ্রূকুটিতে একান্নবর্তী সুখী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের আক্রমণে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। স্বার্থের নগ্ন রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ভয়ানক সেই পরিস্থিতির দোসর হিসাবে আবির্ভূত হয় স্বাধীনতার নামে হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব। নিদারুণ সেই দুঃখ যন্ত্রণা, প্রত্যক্ষ করে নারীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যদিও তার সেই একান্ত ব্যাকুলতায় কারো কিছুই এসে যায় না। সাম্প্রদায়িকতা আর স্বাধীনতার উন্মত্ত দাপাদাপিতে দুই টুকরো হয়ে যায় ভারতভূমি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে পরিবারের কর্তা পাড়ি দিতে চায় পাকিস্তানে। কিন্তু কর্তাকে অবাক করে বেঁকে বসে সেই নারী। কথায়-বুদ্ধিতে-যুক্তিতে-প্রতিবাদে 'সে' থেকে হঠাৎ কেমন করে যেন 'তিনি' হয়ে ওঠেন। সেই 'তিনি' থেকে যেতে চান নিজেদের ভিটেতে। এই ভিটেতে বিয়ের পর তিনি আসেননি। এসেছিলেন তাঁর পরিবার টুকরো হয়ে যাবার পর। পরিবারের টুকরো হওয়াটা তিনি মেনে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু দেশের টুকরো হওয়াটা মানতে পারেননি। তাঁকে কোন ভাবেই বোঝানো যায়নি। তাঁকে কেউ বোঝাতে পারে নি। তাই তিনি থেকে যান সেই ভিটেতেই। স্বামীর রক্তচক্ষু, পুত্র-কন্যার আবেগ বিহ্বল অশ্রু, কিছুই তাকে বিরত করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত স্বামী, পুত্র ও কন্যা সবাই দেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে পাকিস্তান চলে গেলেও সেই নারী একাই থেকে যায় তাঁর সেই নিজস্ব ভূমিতে। একজন সাধারণ নারী দেশ ও মাটির টানে জীবনের সবকিছু তুচ্ছ করে, কেবলমাত্র শিকড়ের জন্য নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিতে কোন দ্বিধা করেন না।

৪.

উপন্যাসের মূল গল্প এরূপ হলেও লেখক গল্পের মধ্যে দিয়ে অন্য কথা, অন্য ভাবনা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। 'আগুনপাখি' প্রকৃতপক্ষে এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের আড়ালে ১৯৪৭ পূর্ব অখণ্ড ভারতের উত্থানপতন, সেই সময়ের রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের তাপ-উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশগঠন ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মাঝে সামাজিক

অবক্ষয়ের এক অভূতপূর্ব আখ্যান। যার অভ্যন্তরে সংসার, সমাজ, ধর্ম, দেশ ইত্যাদি ভেঙে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির উদ্বোধনের, ব্যক্তির বিকাশের চিত্র উঠে আসে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে নয়, ব্যক্তিকে অপমান করে তাকে অস্বীকার করে নয়, 'আগুনপাখি'তে আমরা দেখি সমাজ, সংসার, ধর্ম ও রাষ্ট্রের গতানুগতিক সত্যকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে উঠে দাঁড়াতে। ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে হয়। নতুন করে আবার গড়ে নিতে হয় নীতি-নিয়মের সংসার ও সমাজ ব্যবস্থা। আসলে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিকেই এগিয়ে আসতে হয়। সেই ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন।

উপন্যাসের আখ্যানে ব্যক্তি হিসেবে উঠে এসেছে গ্রাম্য এক নারী। 'আমার মায়ের ক্যাকন মিত্যু হলো আমার বয়েস ত্যাকন আট-ল বছর হবে। ভাইটোর বয়েস দেড়-দু বছর। এই দুই ভাই-বুনকে অকূলে ভাসিয়ে মা আমার চোখ বুজল।'[১] সে মমতাময়ী, সে চিরায়ত বাঙালির এক শান্ত-শীতল রূপ। বিশ্বভুবনের খবর যে রাখে না। স্বজন সংসারের উন্নতি দেখে যে সুখ অনুভব করে। 'শাশুড়ি আমার কাছে এসে বললে, মেতর-বউ, আমি একটা কথা বলি। এই বাড়ির লক্ষ্মী তুমি, তোমার পয়েই সবকিছু আবার হবে। তোমার শ্বশুরের মিত্যুর পর সোংসার ভেসে যেছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে অগাধ পানিতে পড়েছেলম। আমার ঐ মেজো ছেলে সব আবার ফিরিয়ে আনলে। সেই ছেলের বউ তুমি। আমি সব জানি, গায়ের গয়না খুলে দিয়েছ তুমি। আল্লা তোমার ভালো করবে। দোয়া করি তোমাকে।'[২] শাশুড়ির কথায় সে গর্ব অনুভব করে।

সংসারে পরিশ্রম করতে তার কোন কষ্ট হয় না। সংসারের মধ্যেই রয়েছে স্বর্গীয় সুখ। চিরন্তন এই বিশ্বাসে সে অটল থাকে। সেই নারী একদিন বুকের ভেতরে অনুভব করে ভাইদের হাঁড়ি আলাদা হয়ে টুকরো হয়ে যাওয়া একান্নবর্তী পরিবারের করুন আর্তনাদ। যাকে সে এবং তার স্বামী অত্যন্ত যত্নে ও পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিল। সেই পরিবার ভেঙে যাওয়ায় সে আহত হয়। তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, স্বপ্ন, সুখ সবই যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তবে সে সেই আবর্তে আবদ্ধ থাকে না। নতুন করে বেঁচে থাকার পথসন্ধান করে। দুঃখের করুন সুর মনে মনে অনুভব করলেও সে বাইরে তা প্রকাশ করে না। দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই সে আবার নিজের সুখ খুঁজে নিতে চায়।

বিয়ের এক বছরের মাথায় তার একটি ছেলে হয়। যে ছেলে ছিল সংসারের বড় আদরের ধন। সেই ছেলের পর আরও একটি ছেলে হলেও সে গর্ভের মধ্যেই মারা যায়। তারপর একটি মেয়ে হয়। যে মেয়ে ছিল সকলের নয়নের মনি। বড় আনন্দের ধন। তারপর আরো একটি ছেলে হয়। বড় ছেলেটি সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বড় খোকার মৃত্যুর পর আরো একটি খোকা হয়। মোট পাঁচটি সন্তানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিল তিনটি সন্তান। এই তিন সন্তানই বড় হয়ে তার মাকে ছেড়ে, দেশ ছেড়ে নতুন দেশ পাকিস্তানে চলে যায়। অথচ এমন করে দেশভাগ হওয়ার কথা ছিল না। মানুষই ভাগ করেছিল দেশকে। যা মেনে নিতে পারেনি এই নারী। তার কাছে দেশ ছিল একটাই। সেই দেশের মধ্যেই হয়তো একটু দূরে চাকরি করতে গিয়েছিল তার বড় ছেলে (তথা মেজো ছেলে)। চাকরি পাওয়ার পর দেশ ভাগ হয়।

নতুন দেশে চাকরির প্রয়োজনে তাকে সেখানে থেকে যেতে হয়। প্রথম দিকে সে আসা যাওয়া করতে পারলেও নতুন দেশে পাসপোর্ট চালু হওয়ায় তার পক্ষে আসা যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপর তার মেয়ের বিবাহের পর জামাইয়ের চাকরির সূত্রে মেয়ে চলে যায় পাকিস্তানে। মেয়ে সেখানে গিয়ে তার মেজ ভাইকে নিজের কাছে পাঠিয়ে

 All rights reserved. © 2024

দিতে বলে। আর বড় ভাই, ছোট ভাইকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে। তাদের বাবা এতে সম্মত হয়। তারা একে একে নিজের দেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে নতুন দেশ পাকিস্তানে চলে যায়। পাকিস্তানে যাবার জন্য তার স্বামী, সন্তান সবাই তাকে বোঝায়, কিন্তু তার মতো করে তাকে কেউ বোঝাতে পারে নি। এই নারী এসেছিল এক সংসার থেকে আর এক সংসারে। যেখানে শাশুড়ি রূপে উপস্থিত ছিলেন গিন্নি। অর্থাৎ গিন্নির সংসারে একজন নারী প্রবেশ করেছিল। 'তবে নিশ্চিন্তি বটে! কুনো কিছু তো নিজেকে ঠিক করতে হবে না - যা করবার, যা বলবার গিন্নি করবে, গিন্নি বলবে।'[৩] সে যেন কেমন ভারহীন নিশ্চিন্ত জীবন।

এমন নির্ভার সংসারেই তার পাঁচটি সন্তান হয়। ধীরে ধীরে সংসারে সে একদিন গিন্নির স্থান পায়। তার চিরন্তন ধারণায় গিন্নির সংসারেই পুত্রবধূরা আসে। কিন্তু পুত্রবধূর সংসারে গিন্নিরা যায় না। সেখানে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনা। 'চারাগাছ এক জায়গা থেকে আর জায়গায় লাগাইলে হয়, এক দ্যাশ থেকে আর দ্যাশে লাগাইলেও বোধায় হয়, কিন্তুক গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন্ মাটিতে বাঁচে না।'[৪] এই ধারণাই হয়তো তাকে নতুন দেশে যাওয়া থেকে বিরত করে। গল্পের শেষে তাই আমরা দেখি এই নারী একাকী থেকে যায় তার জন্মভূমিতে, তথা তার নিজের বাড়িতে।

সংসারের ঘানিতে আটকে পড়া চিরন্তন এক নারী স্বামী ও সন্তানদের ছেড়ে নিজের মতো করে নিজেকে খুঁজে নিতে চেয়েছে। যে খোঁজা এতদিন তার হয়ে ওঠেনি। সংসারের চাপে, দায়বদ্ধতায়, স্বামীর ভয়ে, কিছুটা লোক লজ্জার খাতিরে নিজেকে সে গুটিয়ে রেখেছিল। 'পিথিমিতে এলম কিন্তুক পিথিমির কিছুই দেখলম না। কবে একদিন মায়ের প্যাট থেকে পড়লম, দুনিয়াতে এসে চোখ দুটি মেললম, হয়তো দুবার জোরে চিচ্কার করে কেঁদেছেলম, ঐ পয্যন্তই। তাপর এত কাল পার করলম, কিছুই দেখলম না পিথিমির। সারা জেবনে বাড়ি থেকে তিন কোশ চার কোশের বেশি যেতে হয় নাই। কেউ নিয়ে যায় নাই। মাঠ-ঘাট, ঘরবাড়ি, আসমান-জমিন ওইটুকুনই যা দেখলম। কবর কেমন হবে জানি না তবে মনে হয়, কবরের থেকে একটু বড় এই সোংসার। কবরের জায়গাটো তবু নিজের নিজের, সোংসারের সবটো নিজের লয়।'[৫] এই আক্ষেপ সে বহু যত্নে লালন করেছে তার অন্তরে।

দেশভাগ হওয়ার পর চেনা দেশটাই যখন অচেনা হয়ে যায়, চারপাশের মানুষগুলোই যখন দূরে সরে যায়, তখন নিজের মধ্যে সেই বোধ জাগে। চরম ব্যস্ততার মধ্যে যে আওয়াজগুলো এতদিন তার মধ্যে চাপা পড়েছিল বুকের গভীরে অতলে। আজ এই চরম একাকিত্বের মাঝে, চরম নিস্তব্ধতার মাঝে সেই আওয়াজগুলো সে শুনতে পায়। 'বাড়িতে আমি একদম একা, অ্যানেক আওয়াজ হতে লাগল সারা বাড়িতে। পচ্চিম দিকের আসমানটো দেখতে পেচি, একটো তারা দেখতে পেচি, কতোদিন বাদে মায়ের মুখটো দেখতে পেচি, কুন এক জগতের গাছপালা মাঠ ঘাট দেখতে পেচি আর কানে আসছে কতো রকমের আওয়াজ।'[৬]

সে বুঝতে পারে সবার মধ্যে থাকলেও, সবার জন্য কাজ করলেও সে তাদের থেকে আলাদা। যতই মিল থাকুক, যতই ভালোবাসা থাকুক, তা সত্ত্বেও সে আলাদা। 'আমাকে আরও বোঝাইতে পারলে না যি ছেলেমেয়ে আর জায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।'[৭]

আলাদা বলেই সে আলাদা করে ভাবতে শেখে। নিজের অস্তিত্বকে সে নতুন করে আবিষ্কার করে। 'আমি কি ঠিক বোঝলম? সোয়ামির কথা শোনলম না, ছেলের কথা শোনলম না, মেয়ের কথা শোনলম না। ই সবই কি বিত্তি-বাইরে হয়ে গেল না? মানুষ কিছুর লেগে কিছু ছাড়ে, কিছু একটা পাবার লেগে কিছু একটা ছেড়ে দেয়। আমি কিসের লেগে ছাড়লম? অনেক ভাবলম। শেষে একটি কথা মনে হলো, আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি।'[৮]

নিজেকে আবিষ্কারের জন্য দাম দিতে হয় প্রচুর। জীবনের সবচেয়ে বড় এবং নির্ভরযোগ্য মানুষগুলোকে মুক্তি দিতে হয়। সে জানে যারা দূরে গেছে তারা আপন ছিল বটে কিন্তু তাদের আটকানোর কোন ক্ষমতা তার নেই। 'আমি এই বুঝি যি ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে আজকালকার দিনে আর কাছে থাকতে পারে না। কাছে রাখতে গেলেই তারা আর বড় হতে পারবে না। দিনকাল বদলাইছে, তাদের ছেড়ে দিতেই হবে। তাদের জেবন আলেদা হবে, সোংসার আলেদা হবে। তার লেগে আমি ক্যানে আমার বাড়ি, আমার দ্যাশ ছাড়ব? আমি জানব তোমরা সবাই দূরে গেয়েছ।'[৯] তাই নতুন করে আবার সে শুরু করতে চায়। নতুন সকালের জন্য অপেক্ষা করে। নতুন আলোর মধ্যে নিজেকে সে চিনে নিতে চায়। তাই সে পূব দিকে মুখ করে বসে। নতুন জীবনের জন্য সংকল্প করে। নতুন করে উঠে দাঁড়াতে চায়। 'সকাল হোক, আলো ফুটুক, তখন পূবদিকে মুখ করে বসব। সুরুজের আলোর দিকে চেয়ে আবার উঠে দাঁড়াব আমি। আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি।'[১০] সে যে একা, তা সে জানে। একা হলেও তার সামনে পড়ে রয়েছে বিশ্ব জগৎ। তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে একান্ত আপনজনেরা। তাতে সে দুঃখ পেলেও ভয় পায় না। সে জানে একা হলেও দেশের সবাইকে সে আপন করে নিতে পারবে। সে শক্তি তার আছে। উপন্যাসে এই নারীকে আমরা দেশ-জননী হয়ে উঠতে দেখি না। লেখক তা দেখান নি। তবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই নিঃসঙ্গ নারীর সামনে অপেক্ষা করছে আগামী দিনগুলো। সে আপন করে টেনে নিতে পারে সবাইকে এই বিশ্বাস তার আছে। যে জননী এতদিন ছিল সংসারের মধ্যে আবদ্ধ, সেই জননী আজ দেশের সামনে তথা বিশ্বের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়। সংসারের জননী থেকে সে হয়ে উঠতে চায় প্রকৃত দেশ-জননী।

৫.

সংসারের মধ্যে থাকতে থাকতেই সে তার স্বামীর সহযোগিতায় পড়াশোনা শেখে। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়। শিক্ষার আলো তার মধ্যে প্রবেশ করলেও সে যে সব সময় সেই আলোয় চমকিত হয় এমন নয়। সংসারের বোঝা বইতে বইতে, দায়িত্ব পালন করতে করতে কেমন করে যেন সেই আলোর দিকে চাওয়ার আর তার সময় হয়ে ওঠে না। তবে সে বুঝতে পারে তার মধ্যে আলোর আবির্ভাব ঘটেছে। জীবনের চরম মুহূর্তে যখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন সেই আলোই তাকে সাহায্য করে। তার ভেতরের আলোয় ঘনীভূত মানুষটা কেমন যেন প্রতিবাদ করে ওঠে। সে তার স্বামীকে প্রশ্ন করে- 'ক্যানে যাবে'? পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য তার উপর জোর খাটাতে চাইলে সে দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে- 'আমি যাব না'। জায়গা জমির কথা বলে ভয় দেখাতে চাইলে সে তার সিদ্ধান্তের কথা জানায়- 'এই বাড়িতে আমি থাকব'। প্রথমবার সে প্রশ্ন করলেও দ্বিতীয়বার থেকে সে তার সিদ্ধান্ত জানাতে থাকে। তার মধ্যে এত শক্তি কোথা থেকে এলো, তা জানতে চাইলে সে বলে তার নিজের শিক্ষার কথা। এতদিন সে শুধু শুনেছে অন্যের কথা। শুনেছে আর বুঝেছে। আর সেই বোঝা থেকেই সে কখন যেন নিজের মতো করে বলতে শিখেছে। এই শিক্ষাই তাকে একজন সত্যিকারের জননী রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

বড় হতে গেলে সইতে হয়। সেই সহ্যের পরিমাণ যত বেশি হয় মানুষ তত বড় হয়। আর বড় মানুষদের দ্বারাই সমাজের বড় বড় কাজ সম্পন্ন হয়। অভাবের তাড়নায় একদিন তার ছোট ভাইটিকে মামারা নিয়ে গেছে। সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেনি। তার নিজের সংসারে যেখানে খাওয়া পরার কোন অভাবই ছিল না, সেখানে কালের নিয়মে অভাব উঁকি মারলে সংসার টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে আটকাতে পারে নি। চেনা মানুষগুলো কেমন যেন স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই অচেনা মুখগুলো দেখে সে শিউরে ওঠে। দেশভাগ তার আপন সন্তান-সন্ততি এমনকি স্বামীকেও পর্যন্ত তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এত বিচ্ছেদের মাঝেও সে স্থির থেকে যায়। সে মনে মনে ভাবে সবাই গেলেও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবরের মধ্যে তখনও শুয়ে আছে। সে তার জননীকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবে না। তার অন্তিম পরিণতি হয়তো পুত্রের পাশেই একদিন হবে। কালের নিয়মে জীবনের সমাপ্তি যখন আসবেই, তখন তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। বরং সেখানে নতুন করে কিভাবে বাঁচা যায় সেই চেষ্টা করাই ভালো। তার জন্য সে রাতের নীরব অন্ধকারে জীবনের সুগভীর তলদেশে নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে বেড়ায়। একক সেই নির্ভিক সত্তাকে আবিষ্কার করার পর ভাবি জীবনের সংকল্প করে। সকালের নবীন সূর্যের জন্য সে অপেক্ষা করে। নবীন আলোয় সবাইকে সে আপন করে নিতে চায়। বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়কে সে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে নিতে চায়। মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে সে আবার জননী হয়ে উঠতে চায়। নবাগত সন্তানেরা আর কিছুতেই তাদের জননীকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে রাতের অন্ধকারে। হয়তো সেই জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তার জীবনের প্রকৃত সুখ, চিরন্তন আনন্দ, সত্যিকারের মুক্তি।

তথ্যসূত্র :

১) হাসান আজিজুল হক; আগুনপাখি; অষ্টম সংস্করণ, ২০১৫; দেজ পাবলিশিং; কলকাতা; পৃ- ৭

২) পূর্বোক্ত; পৃ- ৪৪

৩) পূর্বোক্ত; পৃ- ২৯

৪) পূর্বোক্ত; পৃ- ২৪৫

৫) পূর্বোক্ত; পৃ- ১২৮

৬) পূর্বোক্ত; পৃ- ২৫১

৭) পূর্বোক্ত; পৃ- ২৫২

৮) পূর্বোক্ত; পৃ- ২৫২

৯) পূর্বোক্ত; পৃ- ২৪৯

১০) পূর্বোক্ত; পৃ-২৫২

Citation: পুরকাইত, সু. (2024) আগুনপাখি :জননী থেকে দেশ-জননী হয়ে ওঠার আখ্যান".*Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-2, DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020200011